দৈনিক ইত্তেফাক

011

তারিখ 28 JAN 1987
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

চড়ুরঙ্গ

সুহৃদ

'মানুষের জীবনে হতাশা একটি বড় সমস্যা। আমরা যা চাই তা পাই না। আর যা পাই তা হয়তো চাই না। তাই বঞ্চিত মনে হতাশাজনিত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষোভ অবদমিত হয়ে পরে দেখা দেয় নানা প্রকার জটিল মনোদৈহিক ব্যাধি, যা জীবনের সব আনন্দকে ম্লান করে দেয়। আমাদের সমস্যা সংকুল সমাজ ব্যবস্থার দরুন এই হতাশা-গ্রস্ত রোগীদের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।'

এই কথাগুলি বাংলাদেশের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী প্রফেসার এম, ইউ, আহমদের। ১৯৭৯ সালে তাঁর ধারাবাহিক কিছু লেখা বেরিয়েছিল সাপ্তাহিক রোববারে। উল্লেখিত কথাগুলি তিনি লেখেন রোববার-এর ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৭৯) সংখ্যায় 'হতাশা ঃ ক্রাসটেশন'—এই শিরোনামে। এতোদিন পর লেখাটার উল্লেখ করছি একটা কারণে। দিন দুই আগে এক যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। পারিবারিকভাবে সে আমার পরিচিত। মাত্র পাঁচ ছয় বছর আগে তাকে দেখেছি চমৎকার স্বাস্থ্যবান, যৌবন পরিস্ফুট হতে থাকা সুশ্রী এক তরুণ, হাসিখুশী, কাজেকর্মে উদ্যোগী। অনেক দিন নানা কারণে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সেদিন তাকে দেখে আমি বিস্মিত, মর্মাহত। বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশী হবে না। এরই মধ্যে স্বাস্থ্য টলে পড়েছে, মুখায়বব কাঠিন্যে আঁকা, চোখ ধসে পড়া। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, মনে হল যেন করুণা-দয়া ভিক্ষা চাইছে।

হতাশা? হ্যাঁ, হতাশারই কাহিনী। সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি তার বাবা। তার চাকরি থেকে অবসর নেয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ি করতে পারেননি। ব্যাংকে জমানো টাকা নেই। তিন মেয়ে তিন ছেলের মধ্যে কেউই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গাতে পারে নি। বড় মেয়েটি একবার এক ছেলের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল, পরে নানা ঘাটের পানি খেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাপের কাছে ফিরে এসেছে। বাকি দুই মেয়ের একজন ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঘরে বসে আছে, কারু সাথে কথাবার্তা বিশেষ বলে না, চুপচাপ বসে থাকে সারাদিন, বুঝা যায় মনোবিকলনে ভুগছে। ছোট মেয়েটি এবং তিন ছেলে এখনো পড়ছে। তবে ইতিমধ্যে তারা প্রত্যেকে বুঝে গেছে সামনে একটা বড় বিপর্যয়ের সময়। কি করবে কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। বড় ছেলেটি (আমার কাছে যে এসেছে), কোনরকমে পাস কোর্সে বি, এটা পাস করেছে গতবার, চেষ্টা করছে চাকরির। বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টাও করছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। যেদিকে তাকায় অন্ধকার মনে হয়। আমার কাছে এসে করুণভাবে জানতে চাইল আমি তার জন্য কিছু করতে পারি কিনা। দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি আরো জানাল, ইদানীং রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না, মাথায় অসহ্য ব্যথা, কতগুলি ভয়াবহ চিন্তা মাঝে-মধ্যে এমনভাবে তাকে গ্রাস করে ফেলে যে, মনে হয় পাগল হয়ে যাবে।

আমি মনোবিজ্ঞানী নই। চাকরি দিয়ে সাহায্য করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। আমার জানা আছে একটি মাত্র উপায়ের কথা। আশা। আশার মোহিনী বাক্যে যতটা সম্ভব তাকে সান্ত্বনা দিতে এবং উদ্দীপ্ত করে তুলতে চেষ্টা করলাম। তাকে জানালাম, শুরুতে আমাদের প্রায় প্রত্যেকের এই ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল। হতাশাই ছিল উত্তরাধিকার। অদৃষ্টের লিখন। হতাশাকে জয় করার নামই জীবন-সাধনা। চেষ্টা, উদ্যোগ এবং মনোবল দিয়েই হতাশা জয় করতে হয়। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্য এছাড়া আর কোনো পুঁজি, আর কোন মিরাকল নেই। ছেলেটিকে আমি সে কথাই বললাম। বললাম, যদ্দিন চাকরি না পাও, স্থায়ী কাজের সংস্থান না হয়, তদ্দিন টিউশনি কর, নিজের যোগ্যতা বাড়াবার জন্য কোনো ভোকেশন্যাল ট্রেনিংয়ের সুযোগ গ্রহণ কর। ছেলেটিকে বললাম আরো বহু কথা। বলতে দ্বিধা নেই, এই কথাগুলো আমি নিজেও বিশ্বাস করি। হতাশা কার না আছে? আমাদের এই মধ্যবয়সেও হতাশা মাঝে-মধ্যে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চায়। ঠেলে ফেলে দিতে চায় সুতোর ওপারে। বাঁচার জন্যে মনোবলকে আঁকড়ে ধরতে হয়। চেষ্টা, উদ্যোগ, পরিশ্রম, এছাড়া হতাশা জয়ের আর কোনো মন্ত্র নেই।

যে ছেলেটির কথা বললাম, তার মতো এমন আছে হাজার হাজার ছেলে—যাদের একই গল্প, একই অবস্থান। হতাশা তাদের অদৃষ্টলিখন। হতাশা তাদের উত্তরাধিকার। হতাশার মধ্যে বসবাস করে তারা তারুণ্য ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টায় নরকের দুর্ভোগ ভোগ করে। আকাংক্ষার সাথে তাদের জীবনের বাস্তবতা মেলে না। তার ওপর অধিকাংশ তরুণ ও যুবকের মধ্যে আছে এক রকমের শূন্যতাবোধ। জীবনের প্রতি তাদের সমূহ অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাস মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি ঘৃণা।

আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে পাস দেওয়া বা পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবণতা সম্পর্কে কোনো গবেষণা-কর্ম এখানে হয়নি। যদি তেমন কোনো গবেষণা-কর্ম চালানো যেত তাহলে হয়তো আমাদের দেশের গড়ে উঠতে থাকা পরবর্তী শিক্ষিত জেনারেশন নিজেদের জন্য কিরকম প্রস্তুতি নিয়েছে, কি তারা চায়, কি তাদের মনমানসিকতা, কি তাদের আকাংক্ষা, কতখানি তাদের চারিত্রিক, দৈহিক ও মানসিক অর্জন, সেসব সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হত। বিষয়টি দেশ ও জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার সকল সভ্য দেশে তরুণ ও যুব-শক্তির গুণগত অর্জনের সঠিক সংখ্যাতত্ত্ব নেওয়ার সাংগঠনিক ব্যবস্থা আছে। আছে নার্সারী, সেকেণ্ডারী এবং ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে অভিভাবক, শিক্ষক এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান বা কেয়ার ফোরাম। প্রতিটি শিশুকে সেসব দেশে ফুলের সাথে তুলনা করা হয়। ফুল যাতে কুঁড়ি মেলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ফুটতে পারে তজ্জন্য যত্ন, শুশ্রূষা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অন্ত নেই। আমাদের দরিদ্র দেশে ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুবা বয়সের ছেলে-মেয়েদের যথার্থ-শিক্ষিত হয়ে গড়ে ওঠার জন্য এই ধরনের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, ফোরাম বা তত্ত্বাবধান নেই বললে হয়। অথচ সবাই চান ছেলে-মেয়েরা ভালো হোক। চরিত্রবান হোক। দায়িত্বশীল হোক। অধিকার-সচেতন হোক। হতাশা ও অন্যান্য প্রতিকূলতার বিপক্ষে জীবনের প্রকৃত যোদ্ধা হয়ে গড়ে উঠুক। কিন্তু এই চাওয়া চাওয়ার মধ্যেই সীমিত। এই চাওয়াকে ভাষা দেওয়ার সাংগঠনিক ব্যবস্থা বলতে শিক্ষায়তনের বাইরে যে উদ্যোগ-প্রচেষ্টা বুঝায়, তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

যে ছেলেটি দিন দুই আগে আমার কাছে এসেছিল, আমি বিশ্বাস করি, চাকরির চেয়েও তার বেশী প্রয়োজন মনোবল। প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তি। প্রয়োজন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসিকতা। কে তাকে এবং তার মতো হাজার হাজার তরুণ ও যুবককে এই মনোবল, ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় মানসিকতা যোগাবে? স্কুল-কলেজের সিলেবাস এই ব্যাপারে কোনো সাহায্যে আসে না। অভিভাবক ও শিক্ষক এই ব্যাপারে প্রায়শঃ কোনো উদ্দীপনা যোগাতে ব্যর্থ। সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমনই যে, সেখান থেকে ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং হতাশা ছাড়া আর কিছু শেখার নেই। আমার খুব জানতে ও বুঝতে ইচ্ছে হয়,—পরবর্তী জেনারেশন তাদের জীবন ও কর্ম-সাধনার প্রস্তুতি তাহলে কিভাবে এবং কোত্থেকে গ্রহণ করবে?

দরিদ্র দেশে ভাতের আকালের মতো আইডিয়ারও আকাল। আসলে জেনারেশন গড়ে তোলার বিষয়টি কোনো গুরুত্বই এখনাবধি লাভ করেনি। হতাশা এক সর্বগ্রাসী দৈত্য। এই দৈত্যের বিরুদ্ধে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কিভাবে যুদ্ধ করবে,—সেই বিষয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। আমরা মনে করি, শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই বিষয়টি গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে—নার্সারী, প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী-হায়ার সেকেণ্ডারী, ইউনিভার্সিটি—সর্বস্তরে সিলেবাস তৈরী করা উচিত এমনভাবে যাতে শিক্ষার্থীরা মনোবল, ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় মানসিকতা অর্জন করতে পারে। সিলেবাসে থাকা উচিত সেইসব বিষয়-সূচী, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে যা সম্ভবায়িত করে তুলতে পারে। আমাদের দেশে সিলেবাস সংস্কারের নামে সাধারণতঃ যা হয় তার সঙ্গে জেনারেশন তৈরীর কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা বলি কর্মঠ, দায়িত্বশীল, অধিকারসচেতন, হাসিখুশী, উদ্যোগী জেনারেশন যাতে গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রাইমারী স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সিলেবাস প্রণয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হোক। দরকার হলে সভ্য উন্নত দেশের কারিকুলার ছক বা মডেল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মূল কথা, সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ক্যাম্পাস এক্টিভিটি বা শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতার বিষয়সমূহ জেনারেশন গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হতাশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তরুণ ও যুব সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে পারে ভালো, উদ্দীপনামূলক বইপত্র, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক এবং দায়িত্বশীল সমাজ। আমরা হয়তো এই অবস্থান থেকে দূরে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি কাগজে ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্র থেকে মেধা ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে পরিণত করা যায়, তবে এই অবস্থান সময়ানুক্রমে আয়ত্ত করা অবশ্যই সম্ভব। বিশেষতঃ লাইব্রেরী বা পাঠাগার আন্দোলনকে যদি সরকার, অভিভাবক এবং সমাজের তরফ থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে অত্যল্পকালের মধ্যে বিরাট ইতিবাচক ফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠাগার আন্দোলনকে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। ভালো বই, উদ্দীপনামূলক বই ভালো বন্ধুর চেয়েও ভালো। বিশেষতঃ হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৎ গ্রন্থ অবলম্বন হিসাবে অদ্বিতীয়। এই কথাগুলি উপদেশের মত মনে হতে পারে, তবে মনে রাখা দরকার, দেশে দেশে যা কিছু ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা হয়েছে বইয়ের দ্বারাই। আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জেনারেশন তৈরী করতে হলে, হতাশার বিরুদ্ধে মানুষকে তৈরী করতে হলে, দেশে কর্ম-জাগরণ শুরু করতে হলে, সুনাগরিকের দায়িত্ববোধ ও অধিকার-সচেতনতা জাগাতে হলে বর্তমানের ডিগ্রিসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, সিলেবাস পার্টে উদ্দীপনামূলক বিষয়সূচী প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে, সুশিক্ষা ও স্ব-শিক্ষার জন্য সারাদেশে জাগিয়ে তুলতে হবে পাঠাগার আন্দোলন। যাঁরা এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং দূরদর্শী তাঁরা একবাক্যে বলেন, আইডিয়ার দারিদ্র্য দূর করতে পারলে বিত্তের অভাব বা দারিদ্র্যও দূর হয় আপনা-আপনি। এই বিষয়ে বারান্তরে আরো কিছু বলার ইচ্ছে হইল।